International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-III, May 2024, Page No.61-68
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v10.i3.2024.61-68

রমাপদ চৌধুরীর আদিবাসী জীবননির্ভর গল্প

ড. মৌসুমী পাল

অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, স্বামী বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়, ত্রিপুরা, ভারত

Abstract:

Storyteller Ramapada Chowdhury has written stories on various subjects. These stories of the author can be classified into several categories. For example – middle class biographical stories, psychological biographical stories, war biographical stories, historical biographical stories, tribal biographical stories, love stories, eccentric stories etc. Ramapada Chowdhury, awanderlust, has spent a long time traveling in tribal areas such as Ranchi, Hazaribagh, Palamau etc. He has closely witnessed the public life of tribals like Munda, Onrao, Santal etc. His stories based on tribal folk life are the product of his direct experience. Their daily lives, superstitions, etc. are depicted in his stories based on tribal life. Primitive Santal, Munda, Onrao, religion, belief, ritual, justice etc. within the society are identified in these stories of the author. I will discuss in this article how the author has presented the sorrow, misery, helplessness, timidity, weakness of tribal people's life in his stories.

Keywords: Short story, Tribal folk life, Coal mine, superstition, Santal.

মূল প্রবন্ধ: ভ্রমণপিপাসু রমাপদ চৌধুরী বেড়ানোর সূত্রে দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন রাঁচি, হাজারীবাগ, পালামৌ ইত্যাদি আদিবাসী জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে। খুব কাছ থেকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন মুন্ডা, ওঁরাও, সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসীদের জনজীবনকে। তাদের প্রাত্যহিক জীবন, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ইত্যাদি রূপ পেয়েছে তাঁর আদিবাসী জীবননির্ভর গল্পগুলিতে। কয়লাখনি অঞ্চল, দেহাতী মানুষ, কুলি-কামিন ইত্যাদির পাশাপাশি এই গল্পগুলিতে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বা দেশী খৃষ্টান চরিত্রেরও দেখা মেলে। গোঁড়ামি বা সংকীর্ণতা, কুৎসিত নৃশংসতা, নোংরামি অভদ্রতা, ইতরতা, অশ্লীলতা, তন্ত্র-মন্ত্রে অন্ধবিশ্বাস ডাইনি বিশ্বাস - এসব কিছুই আদিবাসী জনজীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অশিক্ষা ও দারিদ্র্য তাদের ঠেলে দিয়েছে গভীর অন্ধকারে। আপাতসভ্য সমাজ থেকে অনেক দূরে অবস্থানরত পিছিয়ে থাকা এই জনজীবনকে রমাপদ তাঁর আদিবাসী জনজীবননির্ভর গল্পগুলিতে রূপ দিয়েছেন। তাঁর কোলিয়ারী জীবননির্ভর গল্পগুলি সম্পর্কে সমালোচকের উক্তি – "রমাপদ এক ধরনের গল্প লিখেছেন স্থান-নামের সঙ্গে প্রচলিত অনুষঙ্গ জুড়ে দিয়ে কল্পনাকে মিশ্রিত করে। এই সমস্ত গল্পগুলিতে উপস্থাপিত পরিবেশ সত্য, কিন্তু গল্পের চরিত্রগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লোখকের কল্পনাপ্রসূত।[১]

আদিবাসী মুন্ডাদের জীবনযাপন, কুসংস্কার, পরব ইত্যাদির চিত্রণের পাশাপাশি ইউরোপীয় ও ভারতীয়ের সমন্বয়ই ছিল 'দরবারী' গল্পে লেখকের মূল লক্ষ্য। আদিম সাঁওতাল সমাজের আভ্যন্তরীণ ধর্ম, বিশ্বাস,

আচার, বিচার ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া যায় 'রেবেকা সোরেনের কবর' গল্পে। আদিবাসী অসংস্কৃত সমাজের অন্তর্গত মানুষের তীব্র সংস্কার গল্পটিতে স্থান পেয়েছে। আদিবাসী রমণীর অসহায়ত্ব ফুটে উঠেছে 'জলরঙ' গল্পে। স্থান কালের সঙ্গে কল্পনার সংমিশ্রণ ঘটেছে 'ঝুমরা বিবির মেলা'গল্পে। 'মন্ত্র', 'লাটুয়া ওঝার কাহিনী' গল্পে তন্ত্র-মন্ত্রের প্রতি অন্ধবিশ্বাস স্থান পেয়েছে। এভাবেই রমাপদ আদিবাসীদের অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, জীবনযাত্রাকে গল্পে রূপ দান করেছেন ।

'দরবারী' গল্পটি রমাপদকে অসম্ভব রকমের জনপ্রিয়তা এনে দেয়। 'দরবারী' নামক গল্পগ্রন্থের অতি অল্প সময়ে চৌদ্দটি মুদ্রণ হয়। শুধু 'দরবারী' গল্প নিয়েও একটি বই ছাপা হয়। গল্পটি সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য – "কাল্পনিক ঘটনা বা চরিত্রের মধ্যে প্রতীক হিসেবে যা কিছু ব্যঞ্জনা দিতে চেয়েছিলাম, আদৌ তা পারিনি। যেমন – জোনাথনের মুন্ডা মেয়েকে বিয়ে করা, আসলে ইউরোপীয় ও ভারতীয়ের সমন্বয় বোঝাবার জন্য।...ম্যাক ও ক্লারাকেও চেয়েছি ইঙ্গ-ভারতীয়ের প্রতীক বানাতে। জোনাথন ও শোনিয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যুও আসলে সেই সমন্বয়-স্বপ্নের মৃত্যু।"[২]

সারাদিনে একখানা আপ আর একখানা ডাউন ট্রেন থামা লাপরা স্টেশনে হঠাৎ করে আগমন হয়েছিল জোনাথন ম্যাকক্লাস্কির, সাঁওতাল পল্লীর সবাই যার নামকরণ করেছিল 'পাগলা সাহেব'। মুন্ডাদের সঙ্গে মিশে নেটিভ হবার এবং সহজ সরল মুন্ডাদের নিয়ে বই লেখার স্বপ্ন নিয়ে জোনাথন পাহাড়ের গায়ে বিঘে কয়েক জমি নিয়ে বাংলো প্যাটার্ণের বাড়ি বানিয়ে বাস করতে শুরু করেছিল। লেখক এখানে আদিবাসী মুন্ডাদের জীবনযাপন, কুসংস্কার, হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদিকে তুলে ধরেছেন। ছোট্ট লাপরা স্টেশন থেকে ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ হয়ে ওঠার মাঝে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। এক সময়ের অজ সাঁওতালী গাঁয়ে সভ্যতার আলো প্রবেশ করল, লাপরায় গীর্জা হলো, মুন্ডাদের জন্য মিশনারী স্কুল প্রতিষ্ঠা হলো, পাহাড়ের কোল ঘেঁষে তৈরি হলো ধীরে ধীরে নানা প্রতিষ্ঠান, রেস্ট হাউস, দোকানপাট। সাঁওতাল পল্লীর পরিবর্তনের পাশাপাশি লেখক অশিক্ষিত আদিবাসী মুন্ডাদের অপরিবর্তনীয় সংস্কারকেও তুলে ধরেছেন। মুন্ডারা সভ্যতার নানা উপকরণের সংস্পর্শে এলেও তাদের মানসিকতার কোন পরিবর্তন হয়নি।

জোনাথন ম্যাকক্লাস্কি এইসব কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুন্ডাদের মানসিকতায় পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। পাগলা ম্যাকুসাহেব মুন্ডাদের সঙ্গে মহুয়া খেয়ে আপন করে নিয়েছিল তাদের, মুন্ডাদের মেয়ে শোনিয়াকে ভালবেসে বিয়েও করেছিল। দেহাতী অঞ্চল লাপরা উপনগরী হয়ে একটা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কলোনীতে পরিণত হল। কিন্তু জোনাথনের 'মিশন' পূর্ণ হলো না। কারণ, জোনাথন মুন্ডাদের একজন হতে চাইলেও মুন্ডারাই উল্টে ক্রিস্টান হয়ে গেল। কারণ ক্যাসল, ব্রাউনরা সেখানে এসে স্থায়ীভাবে বাস করতে লাগলেন এবং একে একে 'অশিক্ষিত হিদেনদের অন্ধকার থেকে আলোতে আনতে' সচেষ্ট হলেন।

ইউরোপীয় ও ভারতীয় সংস্কৃতির সমন্বয় সাধনের চেষ্টা জোনাথন ও সোনিয়ার পরিণয়। কিন্তু জোনাথন বাদে অন্য ইউরোপীয়রা মুন্ডাদের উন্নতি কামনা করে না, ফলে কলোনিতে অস্থিরতা দেখা দেয়। কারণ, জোনাথনের পুত্র ম্যাক ইভা হাগিন্সের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে মাকে ঘৃণা করতে শুরু করে। সমস্ত উত্তেজনার পরিসমাপ্তি ঘটে জোনাথন ও শোনিয়ার মৃত্যুতে। ইউরোপীয় সংকীর্ণ মানসিকতাসম্পন্ন চরিত্র ব্রাউন পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে লেখকের বক্তব্যে - "শান্তির দূত যীশুর গরিমা প্রচারের জন্যেই তো যুগে যুগে হিংস্র ক্রুসেডারদের অভিযান। ঈশ্বরের পুত্র যেসাসের ক্ষমা আর অহিংসার ধর্মকে পবিত্র করে তুলতে রেভারেন্ট ব্রাউনের হাত কতটুকুই বা লাল হল।"[৩] নানা প্রলোভন দেখিয়ে সহজ সরল আদিবাসী মুন্ডাদের খ্রীষ্টধর্মে

দীক্ষিত করলেও একশ্রেণীর সাহেবরা যে তাদের খ্রিস্টান মনে করে না, তা স্পষ্ট হয়ে উঠে ব্রাউনের বক্তব্যে – "দি মুন্ডাজ, আর ক্রিশ্চানস্ ওনলি ইন নেম্।"[৪] শান্তির দূত বহনকারীদের হিংস্রতার জন্য মানুষে মানুষে সম্পর্ক যে কত তিক্ত হয় এবং জোনাথনের মতো সৎ মানবকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়, আলোচ্য গল্পে সেই বিষয়টিকেও লেখক তুলে ধরেছেন।

কোলিয়ারীতে কর্মরত আদিবাসী মুন্ডাদের অসহায়ত্বের দিকগুলি প্রতিফলিত হয়েছে 'জলরঙ'(১৩৫৮, সাপ্তাহিক দেশ) গল্পে। আদিবাসী মুন্ডাদের কাছে কোলিয়ারী জীবনধারণের একমাত্র উপায়, আর কোলিয়ারীর মুনশী ওদের ভাগ্যবিধাতা। এদের সরলতার সুযোগ নিয়ে তথাকথিত ভদ্র, শিক্ষিত মানুষেরা তাদের যে কী পরিমাণ নির্যাতন করছে আলোচ্য গল্পে তা পরিস্ফুট হয়েছে। আদিবাসীদের আর্থিক দুর্বলতার সুযোগ নেয় এরা। তাই ধার দেওয়া তিন টাকা কিছুদিনের মধ্যেই হয়ে যায় চল্লিশ টাকা। সঙ্গে সুদ তো আছেই। খাদের মধ্যে নেমে জীবন বাজি রেখে কয়লা সংগ্রহ করা এদের রাত দিনের কাজ। সরকারী নিয়ম অনুযায়ী মেয়ে রেজাদের রাতের শিফটে কাজ করানো নিষেধ। কিন্তু কোলিয়ারীতে মুনশী থেকে ম্যানেজার পর্যন্ত সবাই সরকারী আইন মানলেও যে জন্য এই আইন বলবৎ হয়েছে, তার ইজ্জত রক্ষা হয় না। তাই প্রভান্সের মুখে শোনা যায় – "খাদে এখন রাত পাল্লার ডিউটি দিতে হয় না বটে মেয়েদের, তবে বাবুদের বাংলোয় এখনো...।"[৫] এই বক্তব্যে সহজেই তথাকথিত ভদ্রবাবুদের চরিত্র স্পষ্ট হয়। আবার অন্যদিকে আদিবাসী মুন্ডা মেয়েদের চরম অসহায়ত্বের দিকটিও পরিস্ফুট হয়। এই ভদ্রবাবুদের বিরোধিতা করলে যে কী পরিমাণ নাকাল হতে হয়, মুন্ডা ধাওড়ার মেয়ে রূপমণিই এর প্রমাণ। "রূপমণির মতো তেজী মেয়েই ফণা গুটিয়ে নিলে।"[৬] মিশিরজীর এই আফশোসের মধ্যে মুন্ডা মেয়ে রূপমণির অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করে নেওয়ার পরিচয় পাই। অথচ এই রূপমণিও ভালোভাবে বাঁচতে চেয়েছিল - "পঞ্চায়েতকে দুটো মুরগি আর এক হাঁড়ি মান্ডি দিয়ে পাপ ধুয়ে লিয়েছি আর পাপ করবো না বাবু।"[৭]

আদিবাসী মুন্ডা রমণীদের অসহায়ত্ব, ভীরুতা রূপমণির মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। যারা রূপমণির মতো মেয়েদের অসহায়ত্বের সুযোগ নিচ্ছে, তাদের প্রতি অভিযোগ না করে এরা নিজেদের পাপী মনে করছে। এখানেই রূপমণির দুর্ভাগ্য থেমে থাকেনি ঠিকাদার গোপী সিংয়ের অসৎ উদ্দেশ্য টের পেয়ে তার কথা মতো রূপমণি গোপী সিংয়ের ডেরায় যায়নি বলে তাকে কাজ থেকে বরখাস্ত হতে হয়েছে। রূপমণির চাকতি নম্বর কেড়ে নেওয়া হয়েছে। একজন দয়ালু বাঙালী বাবুকে দুর্নাম থেকে বাঁচানোর জন্য, পরিয়াগের জীবন রক্ষার জন্য রূপমণিকে গোপী সিংয়ের কাছে হার মানতে হয়েছে।

আদিবাসী জনজীবনের দুঃখ, দুর্দশা, অসহায়ত্ব, ভীরুতা, দুর্বলতা 'জলরঙ' গল্পে উপস্থাপিত। আদিবাসীরা যাকে রক্ষক বলে জানে, তারাই হয়ে দাঁড়ায় ভক্ষক - "লোকে বলে আর্মেনিয়াম ঠিকাদার ওর (রূপমণির) বাপ, আর মতান্তরে এ কোলিয়ারীর প্রথম ম্যানেজার মাককিং সাহেবের ছেলে জোনাথন।"**৮** রূপমণির পরিচয় দিতে গিয়ে প্রভান্সের এই বক্তব্যে কোলিয়ারীর ঠিকাদার, ম্যানেজার সবার চরিত্রই এক নিমিষে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। লেখকের শিল্পকুশলতায় স্বল্প পরিসরে যে কোনো ধরনের চরিত্র তাদের নিজস্ব স্বরূপ নিয়ে পাঠকের সামনে উদ্ভাসিত হয়।

'আমি'র জবানীতে লেখা 'বিবিকরজ' (১৩৫৯, রেডিওতে পড়া গল্প) গল্পে ফুলের মত সতেজ, সবুজ, নবীন অনুপমার জীবনের ট্রাজেডি স্থান পেয়েছে। আদিবাসী কামিনদের কোলের শিশুদের জন্য খোলা বেবি-ক্রেশের দায়িত্ব নেবার জন্য আগমন হয়েছিল অনুপমার। বেঁচে থাকার জন্য, দু'বেলা খাবার জোগাড়ের

আশায় শিশুদের নিয়েই কোলিয়ারীতে কাজ করতে যেতে হতো আদিবাসী রমণীদের। তারই বর্ণনা 'আমি'র বক্তব্যে - "অসহায় চোখ তাকানো ছেলেগুলোকে পিঠে জড়িয়ে রেজারা চলেছে ঝুড়ি মাথায়, খাড়াই পথ বেয়ে। আর বোঝার ভারে দু'পাশে চাপ দেওয়া স্প্রিংয়ের মতো কুঁচকে গেছে তাদের সমর্থ শরীর।"**৯** কোলিয়ারী জগতের সেই গ্লানি মুছে নেবার জন্যই অনুপমা এসে পৌঁছেছিল তার পক্ষাঘাতগ্রস্ত স্বামী ও শিশুকন্যা মুন্নুকে নিয়ে। কুলিকামিনদের সুযোগ সুবিধার জন্য বেবিক্রেশ এর গিদরা আয়ু অনুপমার সম্পর্কে ভুল বুঝাতেও সমর্থ হয়। অনুপমার জীবনে ট্র্যাজেডির পাশাপাশি কোলিয়ারীতে কর্মরত আদিবাসী কুলি-কামিনদের জীবনযাত্রা, পেশা ও তাদের সরলতা প্রতিফলিত হয়েছে আলোচ্য গল্পে।

সাঁওতাল সমাজগোষ্ঠীর একসময়ের বিশ্বস্ত ও ঈশ্বরতুল্য ওঝার গল্প 'লাটুয়া ওঝার কাহিনী'(১৩৫৯, শারদীয়া আনন্দবাজার)। আদিবাসী সাঁওতালদের এককালীন অন্ধবিশ্বাসের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে গল্পটিতে। ডাইনী তাড়ানো, সাপের বিষ নামানো, কুকুরের কামড়ের বিষ নামানো ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারে সাঁওতালদের একমাত্র বিশ্বাসের স্থান ছিল লাটুয়া ওঝা ও তার ঔষধ। কিন্তু যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে অশিক্ষিত আদিবাসীদেরও মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে। তাই তারা লাটুয়া ওঝার কাছে ভিড় না করে ভিড় জমায় হাসপাতালে। আদিবাসীদের পরিবর্তনের এই চিত্রের পাশাপাশি লাটুয় ওঝার জীবনের ট্র্যাজেডিও ধরা পড়েছে। হিংস্র ভালুকের আক্রমণে অন্ধ হয়ে যাওয়া লাটুয়া বনজঙ্গল থেকে আর লতৌষধি খুঁজে আনতে পারে না, তাই সে আজ পরিণত হয়েছে ব্যর্থ ওঝায়। ফলে আত্মিক মৃত্যু ঘটেছে তার। একজন সফল ওঝার জীবনের ভয়াবহ দিকের পাশাপাশি অশিক্ষিত সাঁওতালদের অন্ধবিশ্বাস ও তাদের মানসিক পরিবর্তনের চিত্রও তুলে ধরেছেন রমাপদ।

কোলিয়ারী ও সাঁওতাল জনবসতির জীবনচর্যার সুস্পষ্ট ছবি 'রেবেকা সোরেনের কবর'(১৩৬০, শারদীয়া 'আনন্দবাজার')। কারানপুরা কোলিয়ারী এজেন্ট ফার্ণহোয়াইটের বাউন্ডুলে ছেলে ম্যাকুসাহেবের মন কেড়ে নিয়েছে সাঁওতাল কামিন রূপমতী। অথচ রূপমতীর ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল লালুয়া কুড়ুখের সঙ্গে। এরা স্থির করেছিল দু'কুড়ি টাকা জমলেই চলে যাবে কুমান্ডির খাদানে, দু'জনে মিলে বাঁধবে বাসা। কিন্তু ম্যাকুসাহেবের সঙ্গে পাপ করার অপরাধে পঞ্চায়েত তাকে বিটলার সাজা শোনাল। স্বজাতির রোষ থেকে রূপমতীকে উদ্ধার করলো ম্যাকুসাহেব, নিয়ে এলো নিজের বাংলোয়। সাঁওতাল থেকে খ্রিস্টান হল রূপমতী। অসহ্য ঘৃণা আর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে রূপমতী রেবেকা নাম নিয়ে ম্যাকুসাহেবের ঘরণী হল। সাঁওতাল কন্যা রূপমতীর জীবনের ট্রাজেডি বর্ণিত হয়েছে 'রেবেকা সোরেনের কবর' গল্পে। বাংলা সাহিত্যের নব আস্বাদের গল্পটিতে গ্রীক ট্র্যাজেডিসুলভ নিয়তির ক্রীড়া রয়েছে। ম্যাকুসাহেবের সঙ্গে বিয়ের পর রূপমতীর জীবনে সুদিন এসেছিল, কিন্তু ঘটনাচক্রে ফার্ণহোয়াইটের চাকুরী গেল, বাবার আদেশে ম্যাকুকে বিয়ে করতে হবে সিলভিয়াকে, তাহলে হবু শ্বশুর তাকে রেলে একটা চাকুরী করে দিতে পারবে। ফলে সাঁওতাল থেকে খ্রিস্টান হওয়া নববিবাহিতা রূপমতীকে ত্যাগ করতে দ্বিধা করে না ম্যাকু।

আলোচ্য গল্পটিতে রমাপদ মুন্ডা, ওঁরাও প্রভৃতি আদিবাসী অসংস্কৃত সমাজের মানুষের তীব্র কুসংস্কারকে তুলে ধরেছেন। দাঙ্গার অন্ধকারে নিজেকে বাঁচাবার জন্য রূপমতী ম্যাকুর সঙ্গে কিছুক্ষণ অন্ধকারে অবস্থান করেছিল বলে পঞ্চায়েত তাকে 'বিটলা'র সাজা শোনায়, যার ফলে "পঞ্চায়েতের ভয়ে সাহায্য তো দূরের কথা, দেখা হলে কথাও বলবে না কেউ, জিনিস বেচবে না দোকানী। শুধু বিদ্রূপ আর অত্যাচার, না খেতে পেয়ে তিলে তিলে মরতে হবে।"[১০] শুধু তাই নয় গ্রামের মেয়েরা কপাট বন্ধ করে

থাকবে, পুরুষেরা দলে দলে বাঁশি আর মাদল বাজিয়ে ঘিরে ধরবে তাকে, আরেকদল আসবে তীর-ধনুক নিয়ে। অশ্লীল গান আর ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে তাকে উদ্দেশ্য করে, কেড়ে নেবে লজ্জা নিবারণের যৎসামান্য বস্ত্রখানিও। আসলে রমাপদ আদিবাসী অসংস্কৃত সমাজের অশ্লীলতা, নোংরামি ও অভদ্র ইতরতার ভয়াবহতা খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। বাইরের নোংরামিকে আড়াল করার চেষ্টা এদের নেই, বরং ভেতরের নীচতাকে এরা প্রকটভাবে তুলে ধরে আনন্দ লাভ করে। 'বিটলা' যে আসলে নারীর ওপর অত্যাচারের সুলভ উপায় মাত্র, তার রূপমতীর মতো ব্যক্তিত্বময়ী মেয়ের অগোচরে থাকে না - "যে লোকগুলো এত ধরম অধরমের কথা বলছে, ও জানে এরাই এসে ইজ্জত কাড়বে ওর।"[১১] আদিবাসীদের অসংস্কৃত নগ্ন চেহারা এই গল্পটিতে পরিস্ফুট হয়েছে। রূপমতীর এই উক্তির তথাকথিত মুষ্টিমেয় কিছু সমাজপতি নামধারী স্বার্থান্বেষী আদিবাসী লোকেদের নোংরা উদ্দেশ্যকে প্রকটিত করে। আবার অন্যদিকে ''মাধো সোরেনের মেয়ে রূপমতী অথবা রেবেকা তার সতীত্ব গৌরব নিয়ে সাহিত্যে প্রসিদ্ধ ভারতীয় রমণীদেরই সমকক্ষ হয়ে উঠেছে।"[১২]

বাঁকুড়া রায়ের থানে যাত্রাসিদ্ধির প্রতিষ্ঠার বৃত্তান্তকে ঘিরে গড়ে উঠেছে 'সতী ঠাকুরুনের চিতা'(১৩৬০, ১৩৬৪ সালে আপন প্রিয় গল্পগ্রন্থে প্রকাশিত)। গল্পের প্রত্যক্ষ বিবরণের আড়ালে এক অদৃশ্য কালিতে লিখিত হয় সতীদাহ প্রথার কলঙ্ক মুছে ফেলার জন্য ডোমপল্লীর এক অশিক্ষিত পূজারীর প্রথম বিদ্রোহের প্রয়াস। ডোমদের যশাই সিদ্ধপুরুষ হয়ে বাঁকুড়া রায়ের উপাসক হয়েছে। তাকে পূজোর কাজে সহায়তা করতে ব্রাহ্মণকন্যা কল্যাণী যেতো ডোমেদের আখড়ায়। পিতা অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্জে মেয়ের ডোমের আখড়ায় যাবার পথ বন্ধ করার জন্য রাতারাতি বিয়ে দিলেন অশীতিপর এক বৃদ্ধের সঙ্গে। বৃদ্ধ স্বামীর মৃত্যু হলে সহমৃতা হবার জন্য কল্যাণীকে নিয়ে যাওয়া হল শ্মশানে। যশাই পন্ডিত ছুটে এলেন, কল্যাণীর স্বামীকে জীবিত করবেন তিনি। কিন্তু সারারাত চেষ্টা করেও মন্ত্রের ও বাঁকুড়া রায়ের নিষ্ফলতা অনুভব করে নিরুদ্দেশ হলেন। যশাই পণ্ডিতের মন্ত্র পড়ে মৃত ব্যক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করার ব্যাপারে গ্রামবাসীদের বিশ্বাসে তাদের কুসংস্কার ও ধর্মভীতির পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বহুদিন পরে যশাই পুনরায় ফিরে এসে পরীক্ষিত যাত্রাসিদ্ধিকে প্রতিষ্ঠা করল এবং যাত্রাসিদ্ধির থানে ব্রাহ্মণদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করল। তার আদেশ - "যে বামুন নিজের জ্যান্ত মেয়েকে জীবন্ত পোড়াতে পারে সে জাত যেন এ মন্ডপে না ঢোকে।"[১৩] জনশ্রুতি, প্রচলিত আখ্যান, লোকাচার, কুসংস্কার, ধর্মভীতি প্রভৃতির সমন্বয়ে গল্পটি লিখিত। গল্পশেষে লেখকের সংযোজন – "কিন্তু কেউ খবর রাখে না, সতীদাহের কলঙ্ক মুছে ফেলার জন্য প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল ডোমপল্লীর এক অশিক্ষিত পূজারী।"[১৪]

আদিবাসী সমাজের অন্ধবিশ্বাসের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে 'ঝুমরা বিবির মেলা'(১৩৬০, শারদীয়া 'আনন্দবাজার') গল্পে। সোনাডি গ্রামের তুড়ুক সাঁওতালরা ডাইনি প্রথায় বিশ্বাসী। গাঁয়ের আদিবাসীরা বিশ্বাস করে ঝুমরা বিবি ও তার মেয়ে আসমিনা ডাইন। ডাইনি সন্দেহে তাদের মারধোর করে গ্রাম থেকে বের করে দিয়েছিল গ্রামবাসীরা। তারা বিশ্বাস করে "ডাইনিরা যখন মানুষের কলিজা খায় তখন আর চিহ্ন রাখেনা।"[১৫] এই অন্ধবিশ্বাসের পাশাপাশি আরেক ধরনের অন্ধবিশ্বাসের চিত্র ফুটে উঠেছে গল্পে। ডাকাত বুধন কিস্কুর পিতা মিঞা মাঝির অন্ধবিশ্বাস পুত্রের খুনের দায়ে ফাঁসী হলে পিতার কলিজা পুত্রের মধ্যে প্রবিষ্ট হবে এবং বুধন ডাকাতি ছেড়ে দিয়ে সৎ মানুষ হয়ে উঠবে। বুধন ডাকাতি ছেড়ে চাষবাসে মনোযোগী হবে পিতাকে এই প্রতিশ্রুতি দিলে মিঞা মাঝি মিথ্যার আশ্রয় নেয়। অন্য একটা মৃতদেহ পুলিশের কাছে নিয়ে গিয়ে বুধনের মৃতদেহ বলে দাবি করে। পুত্রের হত্যার দায় স্বীকার করে তাকে 'লটকে' (ফাঁসি) দিতে

বলে। কিন্তু ফাঁসির বদলে চার বছর সাজা হলে জেল থেকে বেরিয়ে সে নিজেই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। গল্পটিতে আদিবাসীদের কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের পাশাপাশি বৃদ্ধ পিতার অপত্যস্নেহের দিকটিও প্রকাশিত হয়েছে। সোনাডির তুড়ুক চাষীরা বিশ্বাস করে বুধন ডাকাত ঝুমরা বিবির কাছে ডাইনের মন্ত্র শিখেছে। তাই বুধন – "মাংরা বুরুর নাম করে এখনই মানুষ আবার এখনই হরিণ নয়তো পাখি। হাওয়ায় উড়ে যেতে পারে বুধন, সোনাতুলসীর জলে মিশে যেতে পারে।"[১৬]

গল্পের সমাপ্তিতে দেখা যায়, ঝুমরা বিবি, বুড়ো মিঞা মাঝি সবাই ডাকাত বুধন কিস্কুকে ভুলে গেলেও সোনাডির তুড়ুক চাষীরা ভুলেনি। তাই – "এখনো শীতকালের দিনে সারা গাঁয়ের লোক মেলা বসায়-ঝুমরা বিবির মেলা,...এল্লা বোঙ্গার পূজো দিয়ে একটা মোরগের নাম দেয় ঝুমরা আর অন্যটার মিঞা মাঝি-এরপর দু'জনেরই পায়ে ছুরি বেঁধে ছেড়ে দেয়।"[১৭] বহুদিন অতিক্রান্ত হলেও তুড়ুক সাঁওতালের অন্ধবিশ্বাস দূরীভূত হয়নি – "যে বছর 'ডাইন' মরে আনন্দ ধরে না আর গাঁয়ের লোকের, আর যে বারে 'মিঞামাঝি' মোরগটার চোট লাগে, সেবারে এল্লা বোঙ্গার পূজা চলে সাতদিন ধরে। গাঁয়ের লোকের মুখ শুকিয়ে যায়।"[১৮] প্রচলিত আখ্যান, স্থান-কাল, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ইত্যাদির সঙ্গে কল্পনার সংমিশ্রণে রমাপদ গল্পের অবয়ব নির্মাণ করেন। তিনি বলেন – "আমি নিজেও দেখেছি এ মেলা। ঝুমরা বিবির মেলা। দেখেছি সোনাডির মোরগ লড়াই।"[১৯] এভাবেই তিনি পাঠকের অবিশ্বাসের দায়ভারও পাঠকের উপরই বর্তান – "এখন একে গল্প বলতে হয় গল্প বলুন, ইতিহাস বলতে হয় ইতিহাস।[২০]

"হা-লা-লা-লা, হা-লা-লা-লা বান্দর মার, হা-লা-লা-লা বান্দর মার"[২১] – হ্যাঁ এভাবেই 'মানুষ অমানুষের গল্প' (১৩৬৬, শারদীয়া 'দেশ') গল্পের বাঁদর মারার দল চিৎকার করতে করতে গ্রামে ঢুকে। বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায় বাঁদরমারাদের দল। গ্রামবাসীদের আখের ক্ষেত, জমির ফসল, সব্জির ক্ষেত নষ্ট করে যে বাঁদরগুলো সেই বাঁদরগুলোকে মারার জন্য টাকা আর গামছার চুক্তি হয় গ্রামের মাতব্বরদের সঙ্গে। আলোচ্য গল্পে পশুদের মানুষের সমগোত্রীয় করে উপস্থাপন করেছেন লেখক।

নিজের শিশুকে বাঁচাবার জন্য গল্পে বাঁদরের মায়ের আকুলতা যে কোনো মানব মায়ের তার শিশুর জন্য আকুলতার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। বাঁদর মায়ের কান্না অকলঙ্ক ভট্টাচার্যের অন্তরকে ব্যাকুল করে তোলে – "আহা, অমন করে হত্যা করো না ওদের। বানর নয় হে ওরা, মানুষ। অভিশপ্ত মানুষ ওরা। দেখছো না, মানুষের মতো কেমন বুকে জড়িয়ে রেখেছে ছেলেটিকে।"[২২] "পরিবেশ বিনষ্ট করা, নির্বিচারে পশুদের হত্যা করার বিরুদ্ধে আজ যে বিশ্বজোড়া আন্দোলন গড়ে উঠেছে অকলঙ্ক ভট্টাচার্যকে তার এক আদি প্রবক্তা বলা যায়।"[২৩] আদিবাসী বাঁদর মারা দলের পেশা, জীবনযাপন, হিংসা, যৌনতা ইত্যাদির পাশাপাশি পশুদের উপর মানুষের অত্যাচার ও সমবেদনার একটা মর্মস্পর্শী ও হৃদয় আকুল করা ছবি গল্পে প্রকাশিত – "কিন্তু পরক্ষণেই দেখলেন, ধাড়ীটা ছুটে এসে বসল তার সামনে, ঠিক মানুষের মত দুটি হাত জোড় করে দুটি করুণ চোখে তাকিয়ে রইল। কিচকিচ করে কি যেন বলতে চাইল বাঁদরটা। কিন্তু তার আগেই বাঁদরমারাদের একটা তীর এসে লাগল ধাড়ীটার বুকে। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠেই ছটফট করতে শুরু করলো বাঁদরটা। তারপর নিস্তব্ধ হয়ে গেল। রক্তে ভিজে গেল অকলঙ্ক ভট্টাচার্যের পায়ের তলার মাটি। দু'চোখ বেয়ে জল নামল তার।"[২৪] গ্রামীণ জীবনপট ও পশুদের প্রতি মায়ামমতার যে ছবি এতে ফুটে উঠেছে, বাংলা ছোটগল্পের ধারায় তা অনবদ্য।

বাঁদরমারা দলের টিকালীকে আদিমকন্যার নতুন রূপ বলা যেতে পারে। তার পরিচয়টি সুস্পষ্ট হয়েছে এভাবে – "তারপর তার হিংস্র আর কটা-কটা চোখে রিদে কোটালের মুখের দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলে সে, ফিসফিস করে বললে, 'চ উদিক পানে'।"[২৫] এখানে টিকালী চরিত্র দর্পণের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রিদে আর টিকালীর যৌন সম্পর্কের যে ছবি লেখক আভাসে ইঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন তাতে নারী-পুরুষের আদিম সম্পর্ক চিত্রায়িত হয়েছে। যুগসচেতন লেখক তাঁর শিল্পপ্রতিভার দ্বারা এক অনবদ্য গল্প বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের উপহার দিয়েছেন।

পাহাড়ী, সাঁওতাল শ্রেণির অশিক্ষিত মানুষের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে রমাপদর অনেকগুলি ছোটগল্পে। 'মন্ত্র' (১৩৬৮, শারদীয়া 'দেশ') এমনই একটি গল্প যেখানে লালচাঁদ ওঝা নামে এক রোজার কাহিনী স্থান পেয়েছে। তন্ত্র, মন্ত্র, ঝাড়ফুঁকের প্রতি সাধারণ অশিক্ষিত মানুষের অন্ধবিশ্বাস এতে প্রকাশিত হয়েছে। জনশ্রুতি লালচাঁদ রোজা বিষধর সাপের বিষ ঝেড়ে নামিয়ে মৃত মানুষকে জীবিত করতে পারে। কিন্তু জনশ্রুতি, অপার বিশ্বাস বিফলে গেল যখন লালচাঁদের জড়িবুটি, তন্ত্র, মন্ত্র, নিমের ডালের ঝাড়ন কোন কিছুই কথকের সাপে কাটা দিদিমাকে বাঁচাতে পারলো না। কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন যুক্তি দিয়ে তর্ক বিচার না করে শুধু পরম্পরাজনিত একটা অন্ধবিশ্বাসকেই আঁকড়ে ধরে রেখেছে। নদী-নালা-ঝোঁপ-জঙ্গলে পরিপূর্ণ এই বাংলাদেশে সাপের আনাগোনা বেশি। কিন্তু সব সাপই যে বিষধর, তা নয়। কিন্তু মাঝে মাঝে যথার্থ বিষধর সাপ মানুষকে কামড়ালেই দেখা দেয় যথার্থ বিপত্তি। লালচাঁদ রোজা হয়তো কোনদিন কোন সাপে কাটা রোগীকে বাঁচিয়ে ছিলো আর সেটা উপস্থিত গ্রাম্য মানুষেরা প্রত্যক্ষও করেছিল। কিন্তু সে সাপ যে কতটা বিষধর ছিল সে সম্পর্কে যুক্তিতর্কের প্রয়োজন বোধ করেনি কেউ। তাই যখন কথকের দিদিমাকে যথার্থই বিষধর সাপে কাটল, তখন ওঝার তন্ত্র-মন্ত্র কোন কাজেই এলো না।

রোগীকে বাঁচাতে না পেরে হতাশ হয়ে লালচাঁদ ফিরে গেলেও তন্ত্র-মন্ত্রের প্রতি আজন্ম বিশ্বাসে তার এতোটুকু আঘাত পড়েনি। কান্ত বেদের মেয়ে পার্বতীও বৃদ্ধ লালচাঁদের তন্ত্র-মন্ত্রে এতই বিশ্বাসী যে তার সঙ্গে ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসেছে – "উ রোজা বটেন, ওস্তাদ বটেন। আসল লাগ চিনেন উ, লাগবন্দী মন্তর জানেন। উ খড়ি গুনতে জানেন গো, বিশ লামানোর মন্তর জানেন।"[২৬] কিন্তু পার্বতী অন্যান্য মানুষেরা লালচাঁদের তন্ত্র-মন্ত্রের উপর যত আস্থাই রাখুক না কেন, খোদ লালচাঁদের বিশ্বাসই যেন শেষ অবধি ফাটল ধরেছিল। তাই তার জিজ্ঞাসা – "হাসপাতালের ডাকতোরবাবু নাকি বিষ নামানোর মন্তর জানে বাপ?"[২৭] আর প্রশ্নের সদর্থক উত্তর পেয়ে গম্ভীর লালচাঁদের বিষন্ন উক্তি – "ঠিক বলেছেন গো বাপ, রোজার মন্তর মিছা বটে, রোজার মন্তর মিছা।"[২৮] কিন্তু আজন্মলালিত কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস মানুষকে যে কতটা নিরুপায় করে তুলতে পারে, তাই প্রমাণিত হয় গল্পের শেষে লালচাঁদ রোজার আচরণে। নিজের স্ত্রী পার্বতীকে সাপে কামড়ালে হাসপাতালে যাবার পরিবর্তে বিষহরির প্রতি স্থির বিশ্বাসের কথাই সে বলে। ঠাকুর-দেবতার প্রতি অন্ধভক্তি ,অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার মানুষের জীবনে যে কি ভয়াবহ পরিণতি ঘনিয়ে আনে, 'মন্ত্র' গল্পটি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ বলা যেতে পারে।

তথ্যসূত্র:

১) ঘোষ, প্রসূন, 'রমাপদ চৌধুরীর ছোটগল্প', দ্রষ্টব্য : 'এবং মুশায়েরা', শারদীয়া, ১৪০৯, পৃঃ৪৫
২) চৌধুরী, রমাপদ, 'গল্পসমগ্র', 'প্রসঙ্গকথা', পৃঃ ৮৭৫
৩) তদেব, 'দরবারী', পৃঃ ১৯৮
৪) তদেব, 'দরবারী', পৃঃ ১৯৭
৫) চৌধুরী, রমাপদ, 'গল্পসমগ্র', 'জলরঙ', পৃঃ ২১৭
৬) তদেব, পৃঃ ২১৭
৭) তদেব, পৃঃ ২১৯
৮) তদেব, পৃঃ ২১৭
৯) তদেব, 'বিবিকরজ', পৃঃ ২৩১
১০) তদেব, 'রেবেকা সোরেনের কবর', পৃঃ ২৭৪।
১১) তদেব, পৃঃ ২৭৩
১২) মিত্র, মঞ্জুভাষ, 'রমাপদ চৌধুরী : শিল্পতত্ত্ব ছোটগল্পে', দ্রষ্টব্য: 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি', সঞ্জীবকুমার বসু(সম্পাদিত), পৃঃ ২২১
১৩) চৌধুরী, রমাপদ, 'গল্পসমগ্র', 'ঝুমরা বিবির মেলা', পৃঃ ২৯৫
১৪) তদেব, পৃঃ ২৯৩
১৫) তদেব, 'সতী ঠাকরুণের চিতা', পৃঃ ২৯২
১৬) তদেব, পৃঃ ২৯৫
১৭) তদেব, পৃঃ ২৯৯
১৮) তদেব।
১৯) তদেব।
২০) তদেব।
২১) তদেব, 'মানুষ অমানুষের গল্প', পৃঃ ৩৮২
২২) তদেব, পৃঃ ৩৮৬
২৩) মিত্র, মঞ্জুভাষ, 'রমাপদ চৌধুরী: শিল্পতত্ত্ব ছোটগল্পে', দ্রষ্টব্য: 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি', সঞ্জীবকুমার বসু(সম্পাদিত), পৃঃ ২১৮
২৪) চৌধুরী, রমাপদ, 'গল্পসমগ্র', 'মানুষ অমানুষের গল্প', পৃঃ ৩৮৭
২৫) তদেব, পৃঃ ৩৮৯
২৬) তদেব, 'মন্ত্র', পৃঃ ৪৫৫
২৭) তদেব
২৮) তদেব

সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রিকা:

১) চৌধুরী, রমাপদ, 'গল্পসমগ্র', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯, ২য় নতুন সংস্করণ, অক্টোবর, ১৯৯৯
২) মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, 'বাংলা কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা', দ'জ পাবলিশিং, ৩য় সংস্করণ, এপ্রিল, ২০০৪
৩) রায়, অলোক, 'কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা', সাহিত্যলোক, ১ম প্রকাশ, ১৯৯২
৪) দত্ত, বীরেন্দ্র, 'বাংলা ছোটগল্পের প্রসঙ্গ ও প্রকরণ', (২য় খন্ড), পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯, ৫ম সংস্করণ, ২০০৪
৫) বসু, সঞ্জীবকুমার বসু(সম্পাদিত), 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি', এপ্রিল-সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯
৬)'এবং মুশায়েরা', শারদীয়া, ১৪০৯
৭) 'এবং মুশায়েরা', ১ম প্রকাশ, ২০১০